মুক্তির আলোয় ‘আমার জন্মভূমি’

মুক্তিযুদ্ধের সিনেমার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘আমার জন্মভূমি’। সিনেমাটি নির্মাণ করেছিলেন খ্যাতিমান নির্মাতা আলমগীর কুমকুম। নানা কারণেই গুরুত্বপূর্ণ এই চলচ্চিত্রটি। একদিকে মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্র হিসেবে মূল্যবান এটি। অন্যদিকে এই চলচ্চিত্রটির মাধ্যমে অভিনেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন চিত্রনায়ক আলমগীর। ‘আমার জন্মভূমি’ চলচ্চিত্রের নির্মাতা আলমগীর কুমকুম ডায়াবেটিস ও কিডনির সমস্যায় দীর্ঘদিন ভুগে ২০১২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি মারা যান। **মৌ সন্ধ্যার** প্রতিবেদনে রঙবেরঙের এবারের আয়োজন ‘আলমগীর কুমকুম’ ও তার নির্মিত ‘আমার জন্মভূমি’ চলচ্চিত্র নিয়ে।

মুক্তির আলোয় ‘আমার জন্মভূমি’

মুক্তিযুদ্ধের পরে দেশের ইতিহাস ধরে রাখতে আলমগীর কুমকুম নির্মাণ করেছিলেন ‘আমার জন্মভূমি’ চলচ্চিত্রটি। ৩৫ মিলিমিটার ক্যামেরায় নির্মিত হয়েছিল। সাদা কালো ফ্রেমে সেলুলয়েডের ফিতায় বন্দি হয়েছিল এক অসাধারণ কাহিনি। মুক্তি পেয়েছিল ১৯৭৩ সালের ২৪ অক্টোবর। চলচ্চিত্রটির চিত্রনাট্য করেছিলেন নির্মাতা নিজেই। এর কাহিনি ও সংলাপ রচনা করেছেন আশীষ কুমার লোহ। সংগীত পরিচালনা করেছেন আলম খান। চলচ্চিত্রটির পরিবেষক ছিল প্রিয়তমা বাণী চিত্র।

যাদের অভিনয়ে প্রাণ পেয়েছিল

ঢাকাই সিনেমার এক ঝাঁক তারকা অভিনয় করেছিলেন সিনেমাটিতে। পরিচালক আলমগীর কুমকুম কোন চরিত্রটি কাকে দিয়ে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব; বেশ ভালোই বুঝতেন। এই চলচ্চিত্রটি অভিনেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিল নায়ক আলমগীরকে। এটা ছিল তার অভিষেক চলচ্চিত্র। এছাড়া এই চলচ্চিত্রের মূল আকর্ষণ ছিলেন নায়ক রাজ রাজ্জাক, মিষ্টি মেয়ে খ্যাত নায়িকা কবরী, মিনু রহমান, মেহ ফুজ, রিজিয়া চৌধুরী, সুমিতা দেবী, আনিস, সাই ফুদ্দিন প্রমুখ।

কিছু দৃশ্য ও কাহিনির ছায়া

জন্মভূমি চলচ্চিত্রটি শুরু হয় একটি দেশাত্ববোধক গানের মাধ্যমে। ‘ধন ধান্য পুষ্প ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা’ গানের দৃশ্যায়নের মাধ্যমে পরিচালক দেখিয়ে দেন চিরচেনা নান্দনিক গ্রাম বাংলা। নদী, নদীতে পাল তোলা নৌকা, মাছ। দারুণ প্রকৃতির মাঝে গাঁয়ের বালকের বাঁশি বাজানো। কৃষক, মাঠের ফসল, গাঁয়ের বধূ, পালকি সবকিছুর মাঝেই মুগ্ধতা ছড়ানো। দেখানো হয়, এক ছেলে ও দুই বিবাহযোগ্য মেয়েকে নিয়ে এক বিধবা মায়ের সংসার। বড় মেয়ের বিয়ের জন্য পাত্র খোঁজা হচ্ছে। এন্ট্রি হয় ঘটকের। এক যোগ্য পাত্রের সন্ধান নিয়ে আসে সে। পাত্রের খোঁজ পেয়ে খুশিতে ঝলমল করে ওঠে পরিবারটি। পাত্রী দেখতে আসার তারিখও পাকা হয়। ২৬ মার্চ পাত্রী দেখতে আসবে পাত্রপক্ষ। সবই ঠিক চলছিল। হঠাৎ শুরু হয় পাকিস্তানি বর্বর বাহিনীর অতর্কিত হামলা। বিধবা মায়ের কানে ভেসে আসে গোলাগুলির শব্দ। সব স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। আসল কাহিনি শুরু হয় এখান থেকেই। দেখানো হয় বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ। পুরো সিনেমা জুড়েই দেখানো হয় ১৯৭১ সাল। মুক্তিযুদ্ধের ভয়ংকর দিনগুলোই দৃশ্যায়িত হয় ‘জন্মভূমি’ সিনেমার ফ্রেমে ফ্রেমে। দেশের সাধারণ মানুষের উপর হানাদার বাহিনীর পাশবিক অত্যাচারের দৃশ্যগুলো দেখলে যে কোনো দর্শকের চোখ ছল ছল করে উঠবে। ঘটনাচক্রে মা, বোন, ভাই সবাইকে হারিয়ে একা হয়ে পড়েন কবরী। তার সঙ্গে দেখা হয় একজন চিকিৎসকের। এখানে চিকিৎসকের ভূমিকায় দেখা যায় রাজ্জাককে। একসময় তাদের মধ্যে মন দেওয়া নেওয়া হয়। কাহিনি এগিয়ে যেতে থেকে। রাজ্জাক একজন মুক্তিযোদ্ধাও। নায়ক আলমগীরকেও দেখা যায় মুক্তিযোদ্ধার ভূমিকায়। সব মিলিয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়া থেকে শুরু করে স্বাধীনতা অর্জনের কাহিনিকে এক সুতোয় গেঁথেছেন নির্মাতা আলমগীর কুমকুম।

২২ জানুয়ারি ১৯৪২-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১২

১৯৬৮ সালে তার মামা পরিচালক ইআর খানের সহকারী হিসেবে চলচ্চিত্রে প্রবেশ করেন আলমগীর কুমকুম।

১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন এবং উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৬৯ সালে 'পদ্মা নদীর মাঝি' ছবির মাধ্যমে আলমগীর কুমকুমের চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

'আমার জন্মভূমি' নিয়ে নায়ক আলমগীর

বিভিন্ন সময় 'আমার জন্মভূমি' ও নির্মাতা আলমগীর কুমকুমকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করেছেন নায়ক আলমগীর। চলচ্চিত্র নির্মাতা আলমগীর কুমকুমকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে নায়ক আলমগীর বলেন, 'কুমকুম ভাই আমাকে চলচ্চিত্রে এনেছিলেন। কেন এনেছিলেন, আমার মধ্যে কি এমন পেয়েছিলেন, সেটা আমি আজও জানি না। তবে এতটুকুই জানি তার জন্যই আমি আজ নায়ক আলমগীর। একবার ফার্মগেটের একটি স্টুডিওতে তিনি আমার ছবি দেখে অফার করলেন ফিল্মে কাজ করার। আমি তখন তার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে চলে যাই। কিছুদিন পর আমাদের তেজগাও'র বাড়িটি ভাড়া নিতে এসেছিলেন। জানতে পারি বাড়িটি ফিল্মের অফিস হবে। আমরা তাকে বাড়ি ভাড়া দেইনি। যাওয়ার সময় আমি ছবি করবো কি না আবার জিজ্ঞেস করেছিলেন! যদি ছবিতে কাজ করি তবে এক সপ্তাহের মধ্যে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছিলেন। এরপর বাড়িতে বড় বোন আর দুলাভাইয়ের সঙ্গে আলাপ করি। তারা বলেছিলেন, ওকে, ছবিতে কাজ করো। যেহেতু মুক্তিযুদ্ধের ছবি; ইতিহাস হয়ে থাকবে। তবে এই একটা ছবিতেই কাজ করো। তারপর তার সঙ্গে যোগাযোগ করি। তার সঙ্গে দেখা হলো, আরও দু'চারজন ছিলেন। তারা জানিয়েছিলেন, আমার কথায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আঞ্চলিক টান আছে। শুদ্ধ করে কথা বলা শিখতে হবে। আমাকে বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বিদায় অভিশাপ' পড়তে। আমি পুরোটা না পড়লেও অল্প কিছুদিনে তিন-চারপাতা মুখস্ত করে আবার দেখা করি তার সাথে। তারপর তিনি হেসে বলেছিলেন, আমাকে দিয়েই হবে। আমি কাজ করলাম 'আমার জন্মভূমি' ছবিতে। প্রথমবার আউটডোরে গিয়েছিলাম কুমিল্লায়, ছবিতে কাজের জন্য। আমাদের সাথে ছিলেন রাজ্জাক সাহেব, কবরী। তখন রাতে শুটিং ইউনিটে শোয়ার জায়গা পাইনি। কুমকুম ভাই আমাকে বারান্দায় খড়ের উপর বিছানা পেতে ঘুমাতে বলেছিলেন। পরে কবরী জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেন আমাকে বারান্দায় রাখা হয়েছিল। কুমকুম ভাই বলেছিলেন, যদি এই কষ্ট সহ্য সে করতে পারে, তবে ফিল্মে টিকবে। নয়তো সে ফিরে যাক।' আলমগীর আরও বলেন, 'কুমকুম ভাইয়ের সঙ্গে দেখা না হলে আমি হয়তো আলু-পটলের ব্যবসায়ী হতাম, ফিল্মে আসা হতো না। আমি প্রকৃত মানুষ হওয়ার রাস্তা পেয়েছি তার নির্দেশনা পেয়ে। আজ এই মানুষটি আর আমাদের মাঝে বেঁচে নেই। আমি সবসময় তাকে মন থেকে স্মরণ করি, তার আত্মার মাগফিরাত কামনা করি।'

এক নজরে আলমগীর কুমকুম

আলমগীর কুমকুম ছিলেন চলচ্চিত্রকার, প্রযোজক এবং পরিচালক। গুণী এই পরিচালক ১৯৪২ সালের ২২ জানুয়ারি মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। স্বাধীনতার আগে এদেশে যেসব ছাত্রনেতা রাজপথ কাঁপিয়েছেন, দেশের স্বাধীনতার জন্য বুক পেতে নিয়েছেন নিষ্ঠুর শাসকের অমানবিক অন্যায়-অবিচার, তাদের অন্যতম একজন তিনি।

আলমগীর কুমকুমের কর্মজীবন

১৯৬৮ সালে তার মামা পরিচালক ই আর খানের সহকারী হিসেবে চলচ্চিত্রে প্রবেশ করেন আলমগীর কুমকুম। সহকারী পরিচালক হিসেবে তার প্রথম চলচ্চিত্র 'চেনা অচেনা'। এরপর তিনি 'রূপবানের রূপকথা' এবং 'মধুবালা' চলচ্চিত্রে সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। ১৯৬৯ সালে আলমগীর কুমকুম চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। আলমগীর কুমকুম নির্মিত সর্বশেষ সিনেমা 'জীবন চাবি'।

রাজনৈতিক জীবন

আলমগীর কুমকুম ছাত্রজীবন থেকে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। বঙ্গবন্ধুর আদর্শে ছাত্রলীগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৬ সালের ছয় দফা আন্দোলন এবং ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি বঙ্গবন্ধু সাংস্কৃতিক জোটেরও প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে দীর্ঘদিন এ দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাংস্কৃতিক সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেছিলেন। চলচ্চিত্র নির্মাণের পাশাপাশি তিনি পাকিস্তান আমল থেকে তিনি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আন্দোলনেও ভূমিকা রাখেন।

আলমগীর কুমকুমের যতো চলচ্চিত্র

১৯৬৯ সালে 'পদ্মা নদীর মাঝি' ছবির মাধ্যমে আলমগীর কুমকুমের চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। এতে অভিনয় করেছিলেন আজিম, কবরী, রাজু আহমেদসহ আরো অনেকে। আলমগীর কুমকুম পরিচালিত চলচ্চিত্রের সংখ্যা প্রায় ৪০টি। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'আমার জন্মভূমি', 'স্মৃতিটুকু থাক', 'গুন্ডা', 'রাজবন্দী', 'কাবিন', 'সোনার চেয়ে দামি', 'রকি', 'রাজার রাজা', 'অমরসঙ্গী', 'মমতা', 'আগুনের আলো', 'কাপুরুষ', 'ভালোবাসা', 'শমসের', 'মায়ের দোয়া', 'জীবন চাবি' প্রভৃতি।

সংগঠক কুমকুম

বরেণ্য এই চলচ্চিত্র পরিচালক ছিলেন একজন দক্ষ সংগঠক। তিনি একসময় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র পরিচালক সমিতির সভাপতি হিসেবে সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছেন।

না ফেরার দেশে

দীর্ঘদিন ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও কিডনি সমস্যায় ভুগছিলেন বরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক আলমগীর কুমকুম। হঠাৎ শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে ওঠায় তাকে অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ২০১২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি সোমবার বেলা ১২টা ৪৫ মিনিটে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন আলমগীর কুমকুম। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর। হাসপাতাল থেকে আলমগীর কুমকুমের মরদেহ রামপুরায় তার বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। বাসার পাশেই অনুষ্ঠিত হয় তার প্রথম নামাজে জানাজা। সেখান থেকে তার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় প্রথমে বিটিভিতে ও পরে এফডিসিতে। তার দীর্ঘদিনে সহকর্মীরা তার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। এরপর আলমগীর কুমকুমের মরদেহ বারডেম হাসপাতালের হিমাগারে সংরক্ষণ করা হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সকাল ১১টায় সর্বসাধারণের শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য তার মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে। ওই দিন বেলা আড়াইটায় বনানী কবরস্থানে আলমগীর কুমকুমকে দাফন করা হয়। তার জন্য প্রার্থনা, ওপারে ভালো থাকুক আমাদের গুণী পরিচালক।